The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 117-137, ISSN 2306-3920

ক্যালিগ্রাফিই কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের পরিচায়ক

কাজী মোঃ মহসিন*

[**সার-সংক্ষেপ :** প্রচ্ছদ প্রকাশনার একটি অবিচ্ছেদ অংশ। একটি বইয়ের চেহারা হলো তার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ বইয়ের সাথে পাঠকের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বাংলাদেশে যারা প্রচ্ছদ আঁকেন তারা সবাই মূলত আগে শিল্পী। তারপর প্রচ্ছদশিল্পী। তাই প্রত্যেকের কাজেই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আঁকার স্টাইল, বর্ণ প্রয়োগের ভিন্নতা, কম্পোজিশনের নতুনত্ব। একটি বইয়ের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রচ্ছদের উপর। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রচ্ছদের মানোন্নয়নে তিনি সমগ্র জীবন চেষ্টা করেছেন। প্রচ্ছদে তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার সর্বাধিক জনপ্রিয়। তাঁর আঁকা বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফিই তাঁকে প্রচ্ছদের ভুবনে স্বকীয় অবস্থানে আসীন করেছে। অন্য সবাই যেখানে প্রচ্ছদের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। সেখানে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদের নামলিপি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ফলে প্রচ্ছদ আঁকার জন্য তিনি বিশেষ এক ধরনের ক্যালিগ্রাফিক স্টাইল আবিষ্কার করেন যার ব্যবহার একটি প্রচ্ছদকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ হিসেবে পরিচিত করে তোলে। এই গবেষণায় যুক্তি তর্ক ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়টির যতার্থতা যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণাটি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ সম্পর্কে পাঠককে নতুন করে ভাবাবে। নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে তরুণ গবেষক, প্রচ্ছদশিল্পী, ডিজাইনার ও পাঠকের সামনে।]

সূত্রশব্দ : প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন, ক্যালিগ্রাফি, কাইয়ুম চৌধুরী।

ভূমিকা

একটি প্রকাশনার জন্য প্রচ্ছদ অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হোক সেটা বই, ম্যাগাজিন, বুকলেট, নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি। আবার বইয়ের ক্ষেত্রে গল্পের বই, ছড়া-কবিতার বই, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য-রচনা, পাঠ্যবই প্রভৃতি। একটি বইয়ের চেহারা হলো তার প্রচ্ছদ। একটি প্রচ্ছদ দেখে সেই বই সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। সেই বইয়ের অন্তঃস্থ বিষয় সম্পর্কে পাঠক বুঝতে পারে, বুঝতে চেষ্টা করে। বইয়ের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেনো এবং বইটি যাদের জন্যই রচিত হোক সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বইয়ের জন্য মানসম্মত, বিষয় নির্ভর, সঠিক ও উপযোগী একটি চমৎকার প্রচ্ছদের। কারণ একটি ভালো প্রচ্ছদ একটি ভালো বইয়ের পরিচয় বহন করে। প্রচ্ছদ বইয়ের সাথে পাঠকের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। প্রচ্ছদ একটি পণ্যের মোড়কের ন্যায় কাজ করে। এটি যেমন বইকে সুরক্ষিত রাখে পাশাপাশি পাঠককে বইটির ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। একটি প্রচ্ছদে বইয়ের সামগ্রিক বিষয় ফুটিয়ে তোলা

---

* **কাজী মোঃ মহসিন :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

যায় না। তাই প্রচ্ছদটি এমনভাবে আঁকতে হয় যেনো তা বইটিকে পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করে। একটি প্রচ্ছদের কাজ হলো বইটিকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া। আর পাঠক ধরে রাখার কাজ হলো ভিতরের বিষয়বস্তুর। একজন ভালো প্রচ্ছদশিল্পী লেখকের সাথে আলোচনা করে, পাণ্ডুলিপি পড়ে তার মর্মার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে তার সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে একটি যথাযথ ও মানানসই প্রচ্ছদ রচনা করেন। একজন প্রকৃত প্রচ্ছদশিল্পী কখনোই পাণ্ডুলিপি না পড়ে প্রচ্ছদ আঁকেন না। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এই দিকটিতে আদর্শ উদাহরণ হতে পারেন। পাণ্ডুলিপি না পড়ে তিনি কখনোই প্রচ্ছদ আঁকতেন না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তিনি কখনোই তাঁর কাজের মানের ক্ষতি করেননি। কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রচ্ছদের মানোন্নয়নে তিনি সমগ্র জীবন চেষ্টা করেছেন। কাইয়ুম চৌধূরীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সরাসরি তাঁর চিত্রকর্মকেই প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ফর্ম, রঙের ব্যবহার, কম্পোজিশন সবই তাঁর চিত্রকর্মের সাথে মিলেমিশে একাকার। তাঁর চিত্রকর্মে ব্যবহৃত মুক্তিযোদ্ধার ফিগার, নৌকা, কলাগাছ, ঘরবাড়ি, গ্রাম, নারী অবয়ব, বিশেষত তাঁর আঁকা পাখি বারবারই তাঁর প্রচ্ছদে ফিরে এসেছে। কিন্তু তিনি যে শুধু ইলাস্ট্রেটিভ প্রচ্ছদ করেছেন তা নয়। প্রচ্ছদে তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার সর্বাধিক জনপ্রিয়। তাঁর আঁকা বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফিই তাকে প্রচ্ছদের ভুবনে স্বকীয় অবস্থানে আসীন করেছে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর ছয় দশকেরও বেশি সময়ের প্রচ্ছদশিল্পী জীবনে প্রচ্ছদের নামলিপি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নানাভাবে লেখার ভঙ্গিমাকে ভেঙ্গে চূড়ে আবার নিজের মতো করে গড়েছেন। তবে আশির দশকে এসে ধীরে ধীরে তিনি একটি বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফিক স্টাইল আবিষ্কার করেন যা তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে আঁকা প্রায় সকল প্রচ্ছদেই ব্যবহার করেছেন। প্রচ্ছদের বিষয়বস্তু ও ছবি যাই এঁকেছেন নামলিপি ঐ বিশেষ ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলেই লিখেছেন। এই বিশেষ ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটির নান্দনিকতা ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে একটা সময় সেই বিশেষ ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলের লেখার ধরনটি তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের সার্বজনীন আইকনিক বিষয়ে পরিনত হয়। এই গবেষণায় যুক্তি তর্ক ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে সেই বিশেষ ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলের লেখার ধরনটি কীভাবে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী আঁকা প্রচ্ছদের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিলো তার যতার্থতা যাচাই করার চেষ্টা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, প্রচ্ছদের জগতে কাইয়ুম চৌধুরীর আরেকটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন হলো প্রচ্ছদের পশ্চাৎপট অঙ্কন। তিনিই প্রথম প্রচ্ছদের পশ্চাৎপট অঙ্কন শুরু করেন। সেই থেকে প্রচ্ছদ হয়ে উঠলো আরও স্বাধীন ও প্রাণবন্ত। এছাড়াও প্রচ্ছদের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ পুটের জন্য আলাদা নকশার প্রচলনও তিনিই করেছিলেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

কাইয়ুম চৌধুরী বাংলাদেশের একজন প্রতিথযশা শিল্পী। সেইসাথে একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের ইতিহাসে শিল্পী কামরুল হাসানের পর একক প্রচেষ্টায় যিনি সুউচ্চ আসনে আসীন। তাঁর কাজের মান ও আধুনিকতার জন্য বর্তমান সময়ের গ্রাফিক ডিজাইনারদের কাছেও তিনি অনুসরনীয় আদর্শ। একাধারে তিনি চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক ডিজাইনার, কবি, গল্পকার, প্রবন্ধিক ও মহান শিক্ষক। তবে এতো কিছুর পরও বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পের ইতিহাসে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এক অবিসংবাদিত নাম। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের চাহিদা ছিলো আকাশচুম্বী। তাঁর প্রচ্ছদ আঁকার ক্যারিয়ার প্রায় ছয় দশকের বেশি সময়ের। প্রচ্ছদ নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত গবেষণা করতেন ও নতুন নতুন টেকনিক ও ধারা আবিষ্কার করেছেন। যা বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্পকে করেছে সমৃদ্ধ। আলোচ্য গবেষণায় কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের সামগ্রিক দিক আলোচনা না করে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত তাঁর হাতে আঁকা বিশেষ ঢঙের ক্যালিগ্রাফি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা

হয়েছে। এটি এমন একটি আইকনিক ক্যালিগ্রাফিক স্টাইল যা প্রচ্ছদে এক ঝলক দেখেই চেনা যায় প্রচ্ছদটি কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা। এই গবেষণার মাধ্যমে পাঠক শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে নতুন করে জানার প্রয়াস পাবে। গবেষণা কর্মটির প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা ক্যালিগ্রাফি ও বর্ণিল প্রচ্ছদ জগৎ সম্পর্কে জানা। ক্যালিগ্রাফিই যে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের পরিচায়ক তার যথার্ততা যাচাই করা। একটি প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও তরুণ প্রচ্ছদশিল্পীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ ও ক্যালিগ্রাফি নিয়ে নতুন আঙ্গিকে আলোচনার ফলে তাঁর বর্ণিল প্রচ্ছদ জগৎ সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দেবে এই গবেষণা।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি হাইপোথিটিক্যাল। এই গবেষণাটি সম্পাদনে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। গবেষণা শিরোনামে বর্ণিত বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ে পাঠ বিশ্লেষন পদ্ধতি, তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির পাশাপাশি বিশিষ্টজনদের বক্তব্য ও মতামতকে বিশ্লেষণ ও নিজস্ব যুক্তি তর্কের উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর প্রথম প্রচ্ছদের অরিজিনাল প্রিন্টকপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দশকের আঁকা প্রায় ছয় শতাধিক প্রচ্ছদ সংগ্রহ করে তা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর উপর রচিত বই, সংকলন গ্রন্থ, পত্রিকায় প্রকাশিত কলাম প্রভৃতি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ

একটি বইয়ের প্রচ্ছদ হল যে কোনও প্রতিরক্ষামূলক আবরণ যা একটি বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিকে একত্রে আবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। একটি প্রচ্ছদ শুধু বইকে সুরক্ষিতই রাখে না বরং লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। প্রচ্ছদ এমন একটি ব্যবহারিক শিল্পকলা যেটি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট বইয়ের লেখা, বিষয়বস্তু বা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ইত্যাদিকে আশ্রয় করে। অন্যকথায় তাই প্রচ্ছদকে বলা যায় পরাশ্রয়ী শিল্প। মানে আগে লেখাটার জন্ম হয় তারপর সেই লেখাটাকে আশ্রয় করে প্রচ্ছদ তৈরি হয়। এখানে কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুই মূল। প্রচ্ছদ শিল্পীর এর বাইরে গিয়ে প্রচ্ছদ আঁকার তেমন কোনো সুযোগ নেই। লেখকের ভাবনাকে প্রচ্ছদ সাইজ কাগজের মধ্যে যতদূর সম্ভব ফুটিয়ে তোলার জন্য কোন মাধ্যমে, কোন বিন্যাসে, কোন রঙে, কোন ঢঙে বানাতে হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখেই একটা প্রচ্ছদের জন্ম হয়। [হোসাইন, deshrupantor, Visited: 5 May 2024] প্রচ্ছদ তৈরির ক্ষেত্রে হার্ডকভার এবং পেপারব্যাক ছাড়াও রয়েছে ডাস্ট জ্যাকেট, রিং-বাইন্ডিং এবং পুরানো ফর্ম যেমন উনিশ শতকের "পেপার-বোর্ড" এবং ঐতিহ্যগত ধরনের হ্যান্ড-বাইন্ডিং।

আদিপর্বে বাংলাদেশের গ্রন্থচিত্রনের একটি চমৎকার উদাহরণ হলো পুঁথিচিত্রগুলি, বিশেষ করে পালপুঁথিচিত্রগুলি। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এসব পুঁথিচিত্রের সূচনাকাল ধরা হলেও এর আদিমতম নিদর্শনটি দশম শতকের শেষার্ধের। এসব পুঁথি সংরক্ষণে মূল পৃষ্ঠাগুলির নিচে ও উপরে দুটি কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধাই করা হতো। সেখানে ছবিও আঁকা

থাকতো। [সেলিম (সম্পাদিত), ২০০৭, পৃ. ১৭৬] এ থেকে আমরা পাল আমলে রচিত বইয়ে প্রচ্ছদ অঙ্কনের ধারণা পাই।

একসময় প্রচ্ছদ বলতে বুঝাতো মোটা মলাটের উপর বইয়ের নামলিপি ও লেখকের নাম প্রিন্ট করা। তখনো ছাপার তেমন উন্নতি না হওয়ায় ছবি প্রিন্ট করা খুব কষ্টসাধ্য ছিলো। তাই অবিভক্ত বাংলার প্রাথমিক দিকের বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে কেবল টাইপ কম্পোজ করে ছাপা হতো বইয়ের নাম ও বই রচয়িতার নাম। পরবর্তীতে এই পদ্ধতি প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ তখন বাংলা টাইপ ও হরফের চেহারা অতখানি সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিলো না। ফলে প্রচ্ছদশিল্পীরা প্রচ্ছদে হাতে আঁকা টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফির দিকে ঝুঁকে পড়েন। [হাসনাত (সম্পাদিত), ২০১৬, পৃ. ৭১-৭২] পরবর্তীতে ছাপার উন্নতি হলে প্রচ্ছদশিল্পীরা নিজেদের নৈপুন্য প্রদর্শনের জন্য ছবি প্রধান অর্থাৎ ইলাস্ট্রেশনধর্মী প্রচ্ছদের দিকে আকৃষ্ট হন।

কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফির বিবর্তন

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত। একাধারে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক ডিজাইনার, কবি, প্রাবন্ধিক, আর্ট ডিরেক্টর (শিল্প নির্দেশক), চলচ্চিত্র পরিচালক ও মহান শিক্ষক। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের সকল শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তবে গ্রন্থ নকশায় নতুন নতুন টেকনিক ও ধারা আবিষ্কারে মধ্য দিয়ে একক প্রচেষ্টায় তিনি আমূল পরিবর্তন করে দেন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকায় আজ পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এমন একটা সময় গেছে যখন কাইয়ুম চৌধুরীকে ছাড়া বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের কথা চিন্তাই করা যেতো না। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সম্পর্কে কবি শামসুর রহমান লিখেছেন, ‘কাইয়ুম চৌধুরীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রচ্ছদশিল্পে স্পন্দিত হলো অভিনবত্ব। এই প্রথমবারের মতো এখানকার প্রচ্ছদশিল্পে প্রকৃত আধুনিকতা দেখা দিল প্রবলভাবে। প্রায় তাঁর একার প্রচেষ্টায় এ দেশের গ্রন্থাবলির অঙ্গসজ্জায় ঘটে গেলো রুচির ঋতুবদল।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ গান গায় তাঁর চিত্রে।’ [হক, ২০১৫, পৃ. প্রচ্ছদের পশ্চাতপট] তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজারেরও অধিক। [সেলিম (সম্পাদিত), ২০০৭, পৃ. ১৯৪]

প্রচ্ছদ এমন একটি শিল্প যা অঙ্কনের একটি নিজস্ব ঢং রয়েছে। আঁকার ধরন, আঙ্গিক ও অঙ্কন কৌশলগত দিক থেকে প্রচ্ছদ চার প্রকার হয়ে থাকে। যথা-

১. টাইপোগ্রাফিক/ক্যালিগ্রাফিক
২. ইলাস্ট্রেটিভ
৩. ফটোগ্রাফিক
৪. মিশ্র [কায়সার, ২০০৭, পৃ. ৬]

টাইপোগ্রাফিক/ক্যালিগ্রাফিক প্রচ্ছদে টাইপোগ্রাফিক ও ক্যালিগ্রাফিকই প্রধান বিষয়বস্তু। এই ধরনের প্রচ্ছদে ইলাস্ট্রেশন বা অন্য কোন বিষয় সংযোজিত হয় না। হলেও তা গৌণভাবে উপস্থাপিত হয়। ইলাস্ট্রেটিভ প্রচ্ছদে ইলাস্ট্রেশনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। টাইপোগ্রাফি এখানে গৌণ হয়ে পড়ে। ফটোগ্রাফিক ও মিশ্র প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও তাই। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চিত্রণে শিল্পী যতোটা একাগ্র থাকেন নামলিপির ক্ষেত্রে এক ধরনের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শই তারা কম্পিউটার কম্পোজের আশ্রয় নিয়ে কাজ সম্পাদন করেন। এই যে প্রচ্ছদ আঁকার নানা ঢং, নান ধরন, তন্মধ্যে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সকল ধারাতেই প্রচ্ছদ এঁকেছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর কাজে ইলাস্ট্রেশন ও টাইপোগ্রাফি/ক্যালিগ্রাফি সমান গুরুত্বে অঙ্কণ করা

হয়েছে। তাঁর প্রচ্ছদ আঁকার ক্যারিয়ার প্রায় ছয় দশকের। তন্মধ্যে প্রচ্ছদ আঁকার শুরুর দিকে অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত তাঁর কাজে প্রচ্ছদ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাই। ফলে সেই সময় কোনো একটি একক স্টাইল তাঁর কাজে খুঁজে পাওয়া যায়না। বিভিন্ন দশকে করা কাইয়ুম চৌধুরীর কাজগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুরুর দিকে তিনি ইলাস্ট্রেশন ও ক্যালিগ্রাফিতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ইলাস্ট্রেশন ও ক্যালিগ্রাফিকে ভেঙে চূড়ে প্রতিবারই নতুনভাবে উপস্থাপনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু তিনি প্রচ্ছদ আঁকার শুরুর দিকে কয়েক দশক নিজেকে একটা যায়গায় স্থির করতে পারেনি, তাই সেই সময়টাকে তাঁর ক্রান্তিকালীন সময় বলা যায়। যদিও পরবর্তীতে আশির দশক থেকে পাকাপাকিভাবে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর নিজস্ব উদ্ভাবিত বিশেষ এক ধরনের ক্যালিগ্রাফির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়টাতে আঁকা কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রচ্ছদের বিষয়বস্তু ও ইলাস্ট্রেশন যাই হোক না কেনো নামলিপি তাঁর সেই আইকনিক ক্যালিগ্রাফিতে। আর এই ক্যালিগ্রাফিটির অঙ্কণশৈলী ও কম্পোজিশনের বৈশিষ্ট্য এমন যে, এটি যে কোন বিষয়ের বইয়ের প্রচ্ছদে মানিয়ে যায়। মূলত এর উপস্থাপনগত নৈপুন্যের কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছে। আর এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণ কাইয়ুম চৌধুরীর নিজের। ফলে ধীরে ধীরে এই ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটিই তার আঁকা প্রচ্ছদের মূল আকর্ষন হয়ে উঠে। লেখক, প্রকাশক ও পাঠক মহলে এই ক্যালিগ্রাফির চাহিদা হয়ে উঠে অনস্বীকার্য। প্রচ্ছদে ছবি যাই আঁকেন না কেনো কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি সবার চা-ই চা-ই। এখানে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা বিভিন্ন দশকের প্রায় ছয় শতাধিক প্রচ্ছদকে পর্যালোচনা করে গুরুত্ব বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রচ্ছদকে দশক ভিত্তিক ভাগ করে কীভাবে প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফির বিবর্তন ঘটেছে তা আলোচনা করা হলো-

পঞ্চাশ দশক : সৈয়দ শামসুল হকের *বুনোবৃষ্টির গান* (অপ্রকাশিত, ১৯৫২), জহুরুল হকের *সাত সাঁতার* (কথা বিতান, ১৯৫৮), শামসুর রহমানের *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (বার্ডস অ্যান্ড বুকস্, ১৯৫৯)।

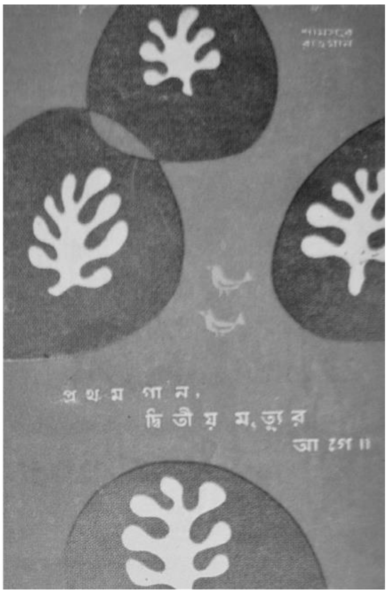

পঞ্চাশের দশককে নবীন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদশিল্পের ভূবনে হাতে খড়ির সময় বলা যায়। ফলে এই দশকের কাজের সাথে পরিণত বয়সের কাজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সময় তিনি জহুরুল হকের *সাত সাঁতার* গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে প্রথম সবার নজর কাড়েন। বইটি প্রকাশ করে কথাবিতান। গ্রন্থটি লেখকের আমেরিকা প্রবাসের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ। প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বোঝানোর জন্য শিল্পী মোজাইক চিত্রের আদলে নকশা করে প্রচ্ছদটি দুটি ভাগে অলংকরণ করেন– প্রথম ভাগে বাংলাদেশের গ্রামীন পুরোনো বাড়ির দেয়াল-নকশার ছবি (চীনামাটির বাসন বা ভাঙা পেয়ালার টুকরা দিয়ে), দ্বিতীয় ধাপে বাইবেল ইলাস্ট্রেশন 'এনানসিয়েশনে'র ছবি। [হাসনাত (সম্পাদিত), ২০১৬, পৃ. ১০৯] প্রচ্ছদে নামলিপিটি তাঁর হাতে আঁকা হলেও তা এখানে মূখ্য বিষয় নয়। কারণ এই নামলিপির এই স্টাইলটি তিনি আর পরে ব্যবহার করেননি। প্রচ্ছদটির মূল আকর্ষণ তার ইলাস্ট্রেশন। এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ১৯৫২ সালে সৈয়দ শামসুল হকের লেখা 'বুনোবৃষ্টির গান' বইটির প্রচ্ছদ দিয়েই তিনি প্রচ্ছদ-জীবন শুরু করেছিলেন। তবে সেই সময় বইটি প্রকাশ হয়নি। [মৌসুমী, bbarta, Visited: 8 May 2024] এছাড়াও শামসুর রহমানের *প্রথম গান*, *দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* বইটিও ইলাস্ট্রেটিভ (ছবি সংযোজিত)। খুব ছোট অক্ষরে ঈষৎ বিক্ষিপ্তভাবে নামলিপিটি লিখেছেন। এখানে টাইপ হিসেবে রোমান টাইপকে বেইজ ধরে এক স্পেস পরিমান বিরতিতে হাতে এঁকে ব্যবহার করেছেন। যদিও এই রোমান টাইপের ব্যবহার শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর পরবর্তী কয়েক দশকের আঁকা প্রচ্ছদে অনেক বারই ঘুরে ফিরে ব্যবহার হয়েছে নতুন নতুন কম্পোজিশনে।

ষাট দশক : এই সময়ে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদগুলোর মধ্যে রয়েছে– শামসুর রহমানের *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০), জসীম উদ্‌দীনের *সুচয়নী* (১৯৬১), জসীম উদ্ দীনের *সুচয়নী* (১৯৬১), সৈয়দ শামসুল হকের *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১), শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), শামসুর রহমানের *রৌদ্র করোটিতে* (বইঘর, ১৯৬৩), *মুহূর্তের কবিতা* (বার্ডস অ্যান্ড বুকস্, ১৯৬৩), জসীম উদ্‌দীনের *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* (নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪), *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* (২য় খন্ড, ১৯৬৪); *জীবন কথা* (১৯৬৪), ফজল শাহাবুদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ *তৃষ্ণার অগ্নিতে একা* (মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৫), আবুল ফজলের আত্মজীবনী *রেখাচিত্র* (১৯৬৫), হাসান হাফিজুর রহমানের *অন্তিম শরের মতো* (সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৬৬), আল মাহমুদের *কালের কলস* (বইঘর, ১৯৬৬), *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৬), বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৭), শামসুল হকের নদীর নাম *তিসতা* (স্টুডেন্ট ওয়েজ), *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭); *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮)।

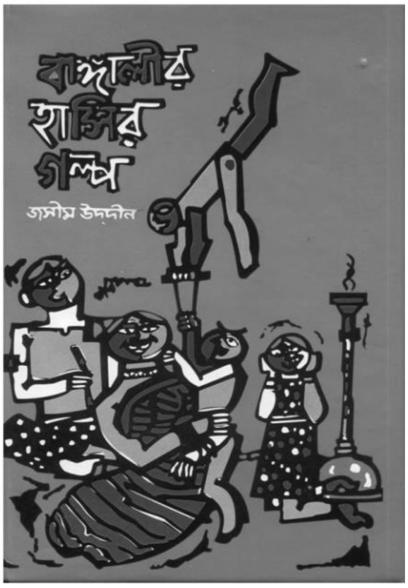

ষাটের দশকে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, ঝোঁক ছিল অর্থবহ প্রচ্ছদ আঁকার প্রতি। এই দশকে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদে নানান ঢং, নানান কৌশল, নানান নিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন, এঁকেছেন প্রচুর প্রচ্ছদ। ১৯৬১ সালে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকেন জসীমউদ্‌দীনের *সুচয়নী* গ্রন্থের প্রচ্ছদ। *সুচয়নী*তে হলুদ পটভূমির উপর নকশীকাঁথার ফর্মে আঁকেন ফুল, মাছ ও পাতা। লেটারিং-এ নকশীকাঁথার সুচকর্মের স্টাইলটি অনুসরণ করেছেন। তবে প্রচ্ছদটি সম্পূর্ণ ইলাস্ট্রেটিভ। এখানে লেটারিংটি গৌণ হিসেবে প্রতীয়মান। এই দশকে কাইয়ুম চৌধুরীর করা বিখ্যাত কিছু ক্যালিগ্রাফিক প্রচ্ছদের মধ্যে রয়েছে– শামসুর রহমানের লেখা কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে*। বইটি ১৯৬৩ সালে বইঘর প্রকাশ করে। ক্যালিগ্রাফিক

প্রচ্ছদের অতি সুন্দর নিদর্শন এই কাব্যগ্রন্থটি। বইয়ের নামটিকে শিল্পী পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে কম্পোজ করেছেন, অক্ষরগুলোকে তৈরি করেছেন ত্রিভুজাকৃতিতে অর্গানিক ফর্মে, এই ফর্মগুলোকে ভরাট করেছেন তুলি দিয়ে ফুল ও লতা-পাতার পেচাঁনো ইলাস্ট্রেশনে। প্রথম দর্শনে বইটি দেখে ফুল, লতা-পাতার ডিজাইন বলে মনে হলেও একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই ক্যালিগ্রাফির আসল সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠে। তবে গ্রন্থের নামলিপির ক্ষেত্রে শিল্পী ব্যবহার করেছেন রোমান টাইপ তাও আবার উল্লম্বভাবে। যা ঐ সময়ের জন্য প্রচ্ছদে একটি নতুন সংযোজন। এই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* ও জসীম উদ্‌দীনের *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* প্রচ্ছদ দুটি ভিন্ন ধারার ইলাস্ট্রেটিভ হলেও তাতে হাতে আঁকা টাইপোগ্রাফির ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু দুটি স্টাইল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তন্মধ্যে *ক্রীতদাসের হাসি* বইয়ের নামলিপিটি ইলাস্ট্রেশনের তুলনায় অতি গৌণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও *মুহূর্তের কবিতা* সম্পূর্ণ ক্যালিগ্রাফিক হলেও কাইয়ুম চৌধুরীর ঠিক স্বভাবসুলভ নয়। এই সময়ের কাজে পূর্বের তুলনায় সুক্ষ্ম কম্পোজিশনের পরিবর্তে এক ধরনের গতিময়তা লক্ষ করা যায়। তবে একক কোন স্টাইলের দিকে কাজগুলো ধাবিত নয়।

সত্তর দশক : এই দশকের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে- বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাংলার ভাষা অন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, আবু রুশদের *নোঙ্গর*, হাসান আজিজুল হকের *নামহীন গোত্রহীন*, হুমায়ুন আহমেদের *নন্দিত নরকে* (১৯৭২), আ.ন.ম. বজলুর রশীদের *পথ বেঁধে দিল*, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের* (১৯৭৪), আবুল হাসানের *পৃথক পালঙ্ক*, *শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৭৬), সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), অধ্যাপিকা তাহ্‌মিনা জামানের বস্ত্র ও পরিচ্ছদ (১৯৭৭), আর্নস্ট ক্যুহনেলের *ইসলামী শিল্পকলা ও স্তাপত্য* (১৯৭৯), বুলবন ওসমানের *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব* (১৯৭৭), জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, *শেষ বিকেলের মেয়ে*, *আরেক ফাল্গুন*, *একগুচ্ছ গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস* (১৯৭২), *বরফ গলা নদী*, *তৃষ্ণা*, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*, আহসান হাবীবের *মেঘ বলে চৈত্রে যাব*, আহসান হাবীবের *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬); *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪); *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা* (১৯৭০); *প্রতিধ্বনিগণ* (১৯৭৩); হাসান আজিজুল হকের *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৫); সাইয়িদ আতীকুল্লাহর *অদম্য পথিকের গান*; আবুল হাসানের *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫)।

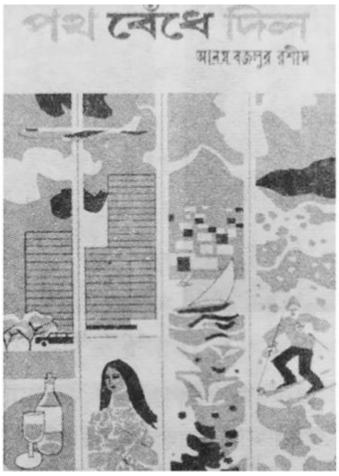

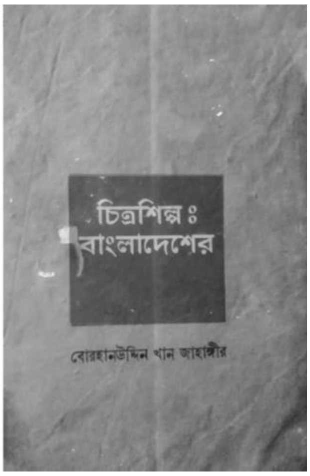

সত্তরের দশকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কাজে ইলাস্ট্রেশনের প্রাধান্য ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি তিনি শুধু টাইপোগ্রাফিক কিংবা ক্যালিগ্রাফিক প্রচ্ছদও এঁকেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ হলো– হুমায়ুন আহমেদের *নন্দিত নরকে*। এখানে শিল্পী রৈখিক ড্রইংকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচ্ছদকে ইলাস্ট্রেটিভ চরিত্র দিয়েছেন। অন্তঃসত্বা রমনীর শরীরকে আধাবিমূর্ত গড়নে রেখায় আঁকা আলংকারিক ফুল-ঘাস-লতাপাতার একটি ফর্মের পটভুমির ওপর আড়াআড়ি স্থাপন করেছেন। এখানে মানব ফিগারটি ছাড়া বাকি ফর্মের মধ্যকার লতাপাতার ইলাস্ট্রেশনটি আগের দশকের ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত শামসুর রহমানের লেখা কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ধারাবাহিক উপস্থাপন। নামলিপির ক্ষেত্রেও এখানে রোমান টাইপের ব্যবহার লক্ষনীয়। বইটি ১৯৭২ সালে খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি ছাপে। একই সালে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা আরও একটি বিখ্যাত প্রচ্ছদ হলো আদিল ব্রাদার্সের বই *পথ বেঁধে দিল* তে। লেখক আ.ন.ম বজলুর রশীদ। বইটি লেখকের ইউরোপ ভ্রমনের ওপর। প্রচ্ছদটি শিল্পীর নিরীক্ষাধর্মী কাজের একেবারে নতুন কম্পোজিশনের একটি উদাহরণ। এই ধরনের কম্পোজিশনে পরবর্তী সময়ে শিল্পী আর কাজ করেছেন বলে দেখা যায় না। একেবারে সাদা জমিনের উপর প্রচ্ছদটিতে চারটে লম্বাটে ধরণের চিত্রমালা আঁকেন। স্কাইস্ক্রেপার দালান, মদের বোতল, গ্লাস, রমনী, সমুদ্র, আকাশ, গাংচিল, উড়োজাহাজ, বরফ, স্কি ক্রীড়ারত পুরুষ ইত্যাদি চিত্র ইউরোপ-আমেরিকার চেহারারই প্রতিনিধিত্ব করে। [কায়সার, ২০০৭, পৃ. ৪৮-৪৯] এগুলোতে তিনি ডিটেল ড্রইং রিয়েলিস্টিক ফর্মে আঁকেননি, তবে এই প্রচ্ছদের আঁকা চিত্রগুলোর আঁকার ঢঙের সাথে শিল্পীর পেইন্টিং-এর সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রচ্ছদটি ইলাস্ট্রেটিভ। এখানেও যথারীতি রোমান টাইপের ব্যবহারে গ্রন্থের নামলিপি লিখেছেন, তবে হাতে এঁকে। এই সময়ে আঁকা *নামহীন গোত্রহীন*, *নন্দিত নরকে*, *পথ বেঁধে দিল* ও *শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* বই চারটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী চারটি ইলাস্ট্রেটিভ প্রচ্ছদের উদাহরন। কিন্তু এই প্রচ্ছদগুলোতে যে যায়গাটিতে মিল রয়েছে তা হলো নামলিপির ক্ষেত্রে সব জায়গায়ই রোমান টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বাংলা একাডেমির বই বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের*, ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত সন্ধানী প্রকাশনীর সৈয়দ শামসুল হকের বই *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* এবং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত মুক্তধারা প্রকাশনীর বুলবন ওসমানের বই *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব* মূলত টাইপ কেন্দ্রিক ডিজাইনে আঁকা তিনটি অত্যন্ত ছিমছাম সরল ও গুরুগম্ভীর মেজাজের প্রচ্ছদ। এখানে উল্লেখ্য এই দশকের ইলাস্ট্রেটিভ হোক আর টাইপোগ্রাফি ভিত্তিকই হোক প্রায় সবখানেই রোমান টাইপের ব্যবহার অনেক বেশি লক্ষনীয়। যদিও এই দশকের পর আবার কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদে রোমান টাইপের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

আশি দশক : সৈয়দ শামসুর হকের *নীল দংশন/নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), সাইয়িদ আতীকুল্লাহর *অদম্য পথিকের গান*, রফিক আজাদের *সশস্ত্র সুন্দর*, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা* (১৯৮২), হাসান হাফিজুর রহমানের *শোকার্ত তরবারি* (১৯৮২), *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২), শামসুর রহমানের *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৮৩), সৈয়দ আলী আহসানের *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (১৯৮৩), *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* (১৯৮৩), *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩), *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা* (১৯৮৪), শামসুল হুদা চৌধুরীর *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (১৯৮৫), শামসুর রহমানের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৫ থেকে সবকটি সংস্করণ), বশির আল হেলালের *ভাষা অন্দোলনের ইতিহাস* (১৯৮৫), বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের *শান্তির জন্য পংক্তিমালা* (১৯৮৬), হায়াৎ মাহমুদের *নজরুল ইসলাম : কিশোর জীবনী* (১৯৮৯)।

আশির দশকে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার অনুষঙ্গ ফটো কম্পোজ ও অফসেট ছাপা পদ্ধতি চালু হয়। অধিকাংশ প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে অফসেট পদ্ধতিতে। এ দশকে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদে আরো উন্নত, আরো সংহত এবং দ্রুত পরিবর্তন এনেছেন অঙ্কনশৈলীর আঙ্গিক। সন্ধানী প্রকাশনী সে সময়ে কবিতার জনপ্রিয়তাকে স্বার্থক করে তুলতে কবিতার বই প্রকাশনায় মনোযোগ দিয়েছিল। তাদের একটি বই শামসুর রহমানের *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশের* প্রচ্ছদে কাইয়ুম চৌধুরী পুরো ক্ষেত্রকে তিন ভাগ করে ওপরে ও নিচে বেগুনী পটভূমিতে সলিড কালোতে বিশেষ ভঙ্গির (ভূমিতে স্পর্শ করা হাত, মাথা নিচের দিকে ও পা উলটো করে উর্ধ্বে উঠানো) মানুষকে খন্ডিত করেন। বিভক্ত নিচের অংশ উপরে এবং উপরের অংশ স্থাপন করেন নিচের অংশে। দুটো পাখির নৃত্যরত ভাবটিও কৌতুহলোদ্দীপক, এখানেও যথারীতি তাঁর হাতের লেখা ক্যালিগ্রাফি। তবে এই ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটি নতুনভাবে উপস্থাপিত। এখানে শিল্পী সলিড রঙে বর্ণগুলোকে ভরাট না করে কলমের সুক্ষ্ম রেখায় শুধু আউট লাইন আঁকেন কিছুটা বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিমায়। আঁশির দশকের মাঝামাঝি কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কন কৌশলে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। মাধ্যম বদলালেন। আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি চালু হওয়ায় তিনি সে সুযোগটা গ্রহণ করলেন। জলরঙ ও গোয়াশে ওয়াশ টেকনিকে প্রচ্ছদ আঁকা শুরু করেন। চিত্রকলাকে তুলে আনলেন প্রচ্ছদে। [হাসনাত (সম্পাদিত), ২০১৬, পৃ. ১১২] *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* ও *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* পুরোপুরি জল রঙের কাজ, বলা যায় ইলাস্ট্রেটিভও। *মুক্তিযুদ্ধের গল্পে* রাইফেল হাতে মাথায় গামছা বাঁধা, পরনে লুঙ্গি একজন দণ্ডায়মান মুক্তিযোদ্ধার ছবি। একই ছবিকে একাধিকবার কপি করে ব্যাকগ্রাউন্ডে ছড়িয়ে

দিয়েছেন। এমনিভাবে *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*ও মনোরম প্রচ্ছদ হয়ে ওঠে জানালা, বৃক্ষ, চাঁদ ও পাখির নান্দনিক উপস্থাপনায়। এই দুটো প্রচ্ছদের নামলিপিও রোমান টাইপ সহযোগে অঙ্কিত। যেখানে *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালির* নামলিপি গুরুগম্ভীরভাবে সমান্তরালে লেখা। আর *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা* গ্রন্থে শিল্পী রোমান টাইপকে বড় বড় অক্ষরে হাতে লিখে অর্ধ বৃত্তাকারে স্থাপন করেছেন।

এছাড়া **১৯৮১** সালে সৈয়দ শামসুল হকের বই *নীল দংশন*, *নিষিদ্ধ লোবানের প্রচ্ছদ* সম্পূর্ণ টাইপোগ্রাফিক। এখানে শিল্পী বিদ্যাসাগর টাইপকে ব্লো-আপ করে নামের চারটি শব্দকেই মাঝখানে ছেঁড়ার এফেক্ট দেন। রং হিসেবে বেছে নেন ইয়েলো অকার জমিনে হালকা কমলা ও হালকা সবুজ। তবে মূল নামলিপি রোমান টাইপ সহযোগে লিখেছেন পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর সমান্তরালে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কাজে প্রাথমিক অবিমিশ্র লাল, নীল ও হলুদ রঙের প্রধান্য বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সাথে উজ্জ্বল রঙ, ধূসর ও গারো রঙের চমৎকার সংমিশ্রণ। তবে শিল্পীর প্রিয় রং ইয়েলো অকার।[হাসনাত (সম্পাদিত), ২০১৬, পৃ. ১২৬]

১৯৮২ সালে প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি গ্রন্থ *রজ্জুপথে চলেছি*। এই প্রচ্ছদটিও ক্যালিগ্রাফিক। কালো জমিনের উপর লেখকের নাম ও বইয়ের নাম চমৎকার নান্দনিক ক্যালিগ্রাফিক রূপে আড়াআড়িভাবে মাঝ বরাবর অধিষ্ঠিত। দুটি লেখার মাঝখান দিয়ে একটি ঝুলন্ত হলুদ রেখা আড়াআড়িভাবে প্রতীয়মান। লেখকের নামের নিচে এমনভাবে রেখাটি আঁকা যেন মনে হয় রশির উপর দিয়ে কেউ হেটে যাচ্ছে। এই নামলিপির স্টাইলটিও চমৎকার নতুনরূপে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত।

এ সময়ে তাঁর করা বিখ্যাত প্রচ্ছদের মধ্যে রয়েছে– সাইয়িদ আতীকুল্লাহ রচিত *অদম্য পথিকের গান*। প্রচ্ছদটিতে আধুনিক ঢঙে বৃক্ষের নিচে বাঁশি বাদনরত ফিগার, চারদিকে চিকন চিকন আড়ম্বিক রেখা। এই প্রচ্ছদটিতে মানব ফিগারের পিছনের অর্গানিক সেপটির সাথে সত্তরের দশকে অঙ্কিত হুমায়ুন আহমেদের *নন্দিত নরকে* গ্রন্থের মানব ফিগারের পিছনে আঁকা সেপটির সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রন্থের নামলিপি এক নতুন ধরনের ক্যালিগ্রাফিতে। তাছাড়া **১৯৮৩** সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসানের *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*তে মোটা ও স্রেফ ভোঁতা তুলিরটানে ক্যালিগ্রাফি দিয়ে পুরো পৃষ্ঠা সাজিয়েছেন, যা এক কথায় অপূর্ব। [হক, ২০১৫, পৃ. ৮৬-৮৭] এই দশকের প্রচ্ছদগুলো শিল্পগুণ ও নৈপুণ্যে অসাধারণ হলেও অঙ্কনশৈলি ও নামলিপির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন নয়। রোমান টাইপের ব্যবহার থাকলেও অধিকাংশ প্রচ্ছদই ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপি সহযোগে এঁকেছেন। তবে এই দশকে আঁকা *অদম্য পথিকের গান* এবং *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* গ্রন্থের নামলিপি দুটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। দুটি গ্রন্থের নামলিপিই তুলির টানে সুনিপুন হাতের ফ্রি স্টাইলের ক্যালিগ্রাফি (চিত্র)। এই নামলিপি দুটি অনেক বোল্ড ও কিছুটা জড়তায় আচ্ছন্ন মনে হলেও এর পরিমার্জিত মুক্ত রৈখিক রূপই পরবর্তিতে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে পাকাপাকি ভাবে ব্যবহার শুরু করেন। এই দশকে এসে তিনি যেনো হস্তলিপির একটি সমাধান খুঁজে পেলেন। আমরা যারা শিল্প সাহিত্যের লোক, লেখক ও গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত যে কেউ যারা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রাখেন, তারা সকলেই শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের যে ক্যালিগ্রাফিটিকে এক ঝলকেই চিনতে পারেন তাঁর পট পরিবর্তন হয়েছিল এই সময়েই। কারণ এর পর থেকে সমগ্র জীবন তিনি এই একটি স্টাইলেই সমস্ত প্রচ্ছদের নামলিপি লিখেছেন।

নব্বই দশক : ১৯৭১ : নব্বইয়ের দশকটি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকেই তিনি প্রচ্ছদের নামলিপি অঙ্কনের একটি সুনির্দিষ্ট দিক খুঁজে পান। তাঁর এই দশকের কাজের মধ্যে রয়েছে– *ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০), *নিষিদ্ধ লোবান*

(১৯৯০); *খেলারাম খেলে যা* (১৯৯১)। হুমায়ুন আহমেদের *নীল অপরাজিতা* (মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯১), *স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২), হুমায়ুন আজাদের যাদুকরের মৃত্যু (১৯৯২), হুমায়ুন আজাদের *বুকপকেটে জোনাকিপোকা* (১৯৯৩), সাঈদ আহমদের *প্রতিদিন একদিন* (১৯৯৩), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), *হাসান বয়াতির সুখ দুঃখ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *জীবনস্মৃতি* (১৯৯৪), প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার *সামরিকতন্ত্র বনাম গণ*তন্ত্র (১৯৯৪), বোরহান আহমেদের *কারাগারের দিনগুলি* (১৯৯৫), নজরুর ইসলামের *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী* (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), শাহরিয়ার ইকবালের *মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), জাহানারা হকের *অপরাহ্নের সংলাপ* (১৯৯৬), মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের *তেরই ভাদ্র শীতের জন্য* (১৯৯৬), পান্না কায়সারের *মুক্তি* (১৯৯৬), আবুল মাল আবদুল মহিতের *স্মৃতি অম্লান* **১৯৭১** (১৯৯৬), সুকুমার বিশ্বাসের *অসহযোগ আন্দোলন'৭১ ও শেখ মুজিবুর রহমান* (১৯৯৬), এ.আর.মল্লিকের *আমার জীবন কথা ও মুক্তি সংগ্রাম* (১৯৯৬), *জহুর হোসেন চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ* (১৯৯৬) আন্তন চেকভের *শঙ্খচিল* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), আবু আল সাঈদ'এর *মুসলিম শাসনকাল, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের *বাংলা ভাষার সংগ্রাম এখনো অসমাপ্ত* (১৯৯৭), মমতাজউদদীন আহমদের *একুশ আমার বাংলা আমার* (১৯৯৭), সৈয়দ আজিজুল হকের *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা সংগ্রহ (১৯৯৮)।

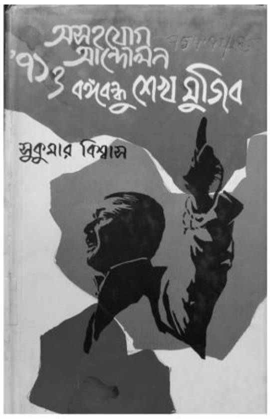

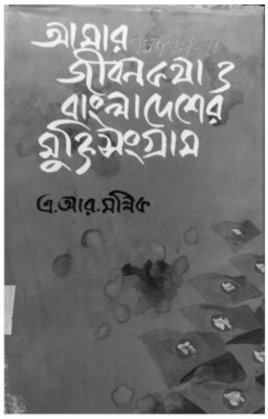

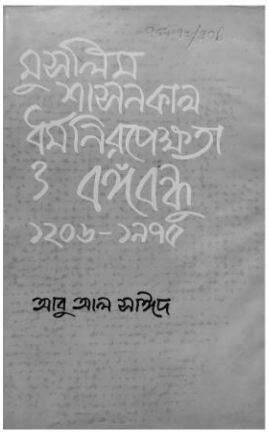

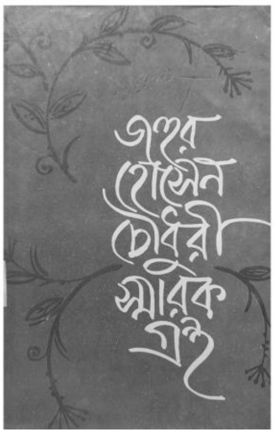

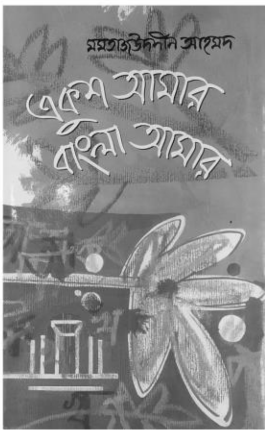

এই দশকে এসে কাইয়ুম চৌধুরী যেনো টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার সমাপ্তি টানলেন। আশির দশকে তিনি যে ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটি আবিষ্কার করেছিলেন তা এই দশকে এসে পরিমার্জিত হয়ে স্থায়ী রূপ লাভ করে তাঁর আঁকা সমস্ত প্রচ্ছদের নামলিপিতে। নব্বইয়েরে দশকে তিনি প্রচুর ক্যালিগ্রাফিক প্রচ্ছদ এঁকেছেন। মূলত গ্রন্থের বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই কোন কোন প্রচ্ছদে তিনি ছবির ব্যবহার করেননি। এক্ষেত্রে আবু আল সাঈদ'এর *মুসলিম শাসনকাল, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ক্যালিগ্রাফিক। ধর্মীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট বলেই হয়ত তিনি শুধু ক্যালিগ্রাফি সহযোগে প্রচ্ছদটি এঁকেছেন। তবে লেখার স্টাইলটি তাঁর স্বভাবসুলভ। এই ক্যালিগ্রাফির স্টাইলটিই কাইয়ুম চৌধুরীকে প্রচ্ছদশিল্পের ভূবনে সবার থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন করেছে। প্রচ্ছদে ইলাস্ট্রেশন থাকুক আর না থাকুক তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফিই তাঁর পরিচয় বহন করে। এই দশক থেকেই তিনি প্রচ্ছদের ব্যাকগ্রউন্ড নানাভাবে চিত্রিত করলেও নামলিপি নিয়ে আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেননি। এই দশকে প্রকাশিত *স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, সুকুমার বিশ্বাসের *অসহযোগ আন্দোলন'৭১ ও শেখ মুজিবুর রহমান*, এ.আর.মল্লিকের *আমার জীবন কথা ও মুক্তি সংগ্রাম*, আবু আল সাঈদ'এর *মুসলিম শাসনকাল, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু, জহুর হোসেন চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, মমতাজউদদীন আহমদের *একুশ আমার বাংলা আমার* সবকটি প্রচ্ছদই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের ব্যাকগ্রাউন্ডে চিত্রিত হলেও নামলিপি একই স্টাইলের। যা পূর্বের দশকগুলোতে দেখা যায়নি। এই দশকেই কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ ভিন্ন টাইপের নামলিপি প্রায় বিলীন হয়ে যায়।

একবিংশ শতাব্দী : মূলত নব্বইয়ের দশক থেকেই বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্পের বাজার প্রসারিত হতে থাকে। আর একবিংশ শতাব্দিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সহজলভ্যতার কারণে মুদ্রণশিল্পের ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রচ্ছদের কাজের চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে যায়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অনেক পরিনত ও বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ট চিত্রশিল্পী। তারপরও এতো ব্যস্ততা ও খ্যাতির ভিড়েও তিনি সমানতালে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। অর্থের জন্য নয় বরং প্রচ্ছদ আঁকার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার টানেই তিনি দিন রাত প্রচ্ছদ এঁকেছেন। শুধু প্রচ্ছদ নয়, প্রকাশনাশিল্পের প্রতি তাঁর ছিল গভীর দুর্বলতা। আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পের মানোন্নয়নে কাজ করে গেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের তালিকা করা দুষ্করই নয় বরং অসম্ভব। এই সময়ে তাঁর করা কিছু কাজের মধ্যে রয়েছে– সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ* (বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ২০০২), এইচ.টি.ইমামের *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), মামুন কায়সারের *বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ* (বাংলা একাডেমী, ২০০৭), স্মারক গ্রন্থ *নিতুন কুন্ডু* (২০০৭), *বাংলাদেশের উৎসব : নববর্ষ* (বাংলা একাডেমী, ২০০৮), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* (বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স, ২০০৮), আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ : ঐতিহ্য-অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ* (২০০৮), *সেলিনা বাহার জামান স্মারক গ্রন্থ* (২০০৫), হুমায়ুন আজাদের *কাব্যসমগ্র* (২০০৫), আনিসুজ্জামানের *কাল নিরবধি* (সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩), আহমদ মাহমুদুর রাজা চৌধুরীর *কালের নিরন্তর যাত্রা* (২০১৫, শিল্পীর আঁকা জীবনের শেষ প্রচ্ছদ), শওকত ওসমানের *জননী* (২০০৩), *জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর আশিতম জন্মদিনের সংবর্ধনা* (২০০৪), শামসুর রহমানের প্রথম ছয় কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান থেকে বন্দী শিবির* (২০১৩), খেতাব পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা *একাত্তরের বীরযোদ্ধা* (প্রথম খণ্ড, ২০১২), খেতাব পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা *একাত্তরের বীরযোদ্ধা* (দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৩), মতিউর রহমানের *আকাশ ভরা সূর্যতারা* (২০১৪), এ.বি.এম মূসার *মুজিব ভাই* (২০১২), বেঙ্গল পাবলিকেশন্স প্রকাশিত *অনন্য আমিনুল ইসলাম* (২০১২), কামাল চৌধুরীর *মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা* (২০১২), মাহবুব হাসান সালেহ্র *কোথায় তুই* (২০১৩), আবদুশ শাকুরের *শ্রোতার কৈফিয়ত* (২০১২), আলী আনোয়ারের

সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা ভাবনা (২০১৩), হায়াৎ মমুদ সম্পাদিত *কিশোর মালঞ্চ* (২০১৪), মোহাম্মদ রফিকের *নির্বাচিত কবিতা* (২০০৭), ফরহাদ মাজহারের *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৮), সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য সমগ্র (২০১৬), মুনতাসীর মামুনের ঊনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের থিয়েটার ও নাটক (২০০৬), ড. সা'দত হুসাইনের মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত (২০০৯), মালেকা বেগমের *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (২০১১), প্রথমা প্রকাশিত নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার *নারী* ১৯৭১ (২০১৫), তারিক সুজাতের *ও প্রাণ ও বর্ণমালা* (২০২০)।

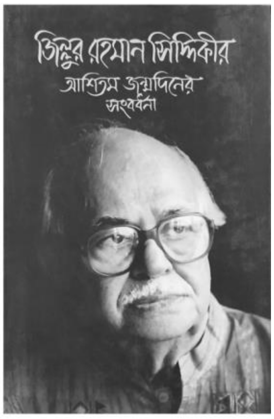

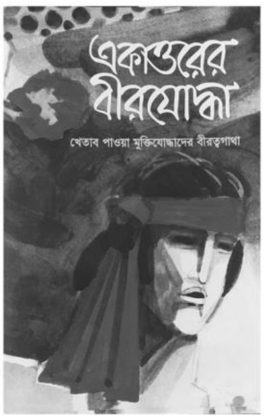

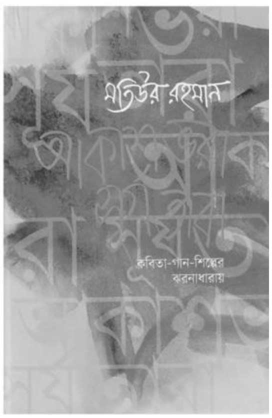

একবিংশ শতাব্দীতে এসে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদের ব্যাকগ্রাইন্ড নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেও নামলিপি নিয়ে আর তেমন কোন চিন্তা ভাবনাই করেননি। কারণ গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকেই প্রচ্ছদে তাঁর হাতে আঁকা বিশেষ ঢঙের ক্যালিগ্রাফির চাহিদা তুঙ্গে উঠে যায়। লেখক, প্রকাশক সবার কাছেই যেনো কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ মানে তাঁর হাতে আঁকা বিশেষ স্টাইলের ক্যালিগ্রাফি। এই ক্যালিগ্রাফি ছাড়া কেউ প্রচ্ছদ নিতে আগ্রহী নয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ আঁকায় পেইন্টিং থেকে প্রায় বেরিয়ে আসেন। সেই যায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড চিত্রনে তিনি ড্রাই ব্রাশ, কালো কালির বোল্ড রেখার ড্রইং, সেই সাথে অনেক বেশি অয়েল প্যাস্টেলের ব্যবহার করেছেন। সরাসরি ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেও প্রচ্ছদ করেছেন অনেক। হয়তো প্রচ্ছদ আঁকায় দ্রুততা ও নতুনত্ব আনয়নের জন্য তিনি এই মাধ্যম গুলোকে বেছে নিয়েছিলেন। তবে পোর্ট্রেট আঁকায় জল রঙের ব্যবহার অব্যাহত ছিলো। প্রচ্ছদ আঁকায় ভিন্নতা থাকলেও এই শতাব্দীতে তাঁর আঁকা প্রায় সমস্ত প্রচ্ছদে হাতে আঁকা আইকনিক ক্যালিগ্রাফি ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। হাতে গোনা দু একটি প্রচ্ছদে প্রয়োজনের তাগিদে কম্পিউটার কম্পোজ করে নামলিপি লিখলেও ভিন্ন কোনো স্টাইলে আর টাইপোগ্রাফি কিংবা ক্যালিগ্রাফি তিনি আঁকেননি। একবিংশ শতাব্দীতে তাঁর মৃত্যুর কিছু কাল আগে থেকেই ছোট্ট একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে কখনোই কাইয়ুম চৌধুরী লেখকের নাম টাইপ করে লিখতেন না। একেবারে শুরুর সময় থেকেই তিনি গ্রন্থের নামলিপির সাথে লেখকের নামটিও হাতে হাতে এঁকে নিতেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় গ্রন্থের নাম তিনি যে স্টাইলে লিখতেন লেখকের নামটিও সেই স্টাইলেই লিখতেন ছোট করে। সেক্ষেত্রে যদি নিজস্ব উদ্ভাবিত লেখার স্টাইলের বাইরে রোমান টাইপ ব্যবহার করতেন তবে লেখকের নামও রোমান টাইপেই লিখতেন। এই যায়গাটিতে শেষের দিকের প্রচ্ছদগুলোতে লেখকের নামটি তিনি কম্পোজ করে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বইয়ের নামলিপি অবশ্যই তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি। এর পাশাপাশি কম্পিউটার প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কল্যাণে তিনি কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সহায়তায়ও কিছু প্রচ্ছদ করেছেন। এই সময়ে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে সহযোগী শিল্পীর নামও দেখতে পাওয়া যায়। প্রচুর চাহিদা ও অতি ব্যস্ততার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি শুধু গ্রন্থের নামটি তাঁর স্বভাবসুলভ ক্যালিগ্রাফিতে লিখে দিতেন। প্রচ্ছদের বাকি কাজটি সহযোগী শিল্পীরা করে নিতেন। কারণ ততদিনে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, প্রচ্ছদে আর যাই থাকুক না কেনো বিশেষ ঢঙের সেই ক্যালিগ্রাফি মানেই এটি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ।

কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে বিশিষ্টজনের মতামত

উপরোক্ত আলোচনায় বিভিন্ন দশকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে নামলিপি বিবর্তিত হয়ে যে বিশেষ স্টাইলে এসে তাঁর পরিচায়ক হিসেবে ধরা দিয়েছে তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন আনিসুজ্জামন। তিনি বলেন– বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচ্ছদ অঙ্কনের অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর ছিল। বর্ণের বিন্যাস ছিল মোহনীয়। বর্ণ বলতে রং ও হরফ দুই-ই বোঝানো যায়। বাংলা লিপির শৈল্পিক রূপায়নে কাইয়ুমের জুড়ি পাওয়া ভার। তাঁর ত'য়ের শুড়টা বাঁদিকে অনেক দুর প্রসারিত হতো; হ্রস্ব-ই কারের মাথাটা বর্ণের মাথায় ছাতার মতো সবটা বেস্টন করে ঝুঁকে পড়তো ডানদিকে; হ বা ই লুডু খেলার সাপের মতো বক্রাকৃতি নিয়ে পাশের হরফগুলোর চেয়ে নিচে নেমে আসতো। এসব শুধু দৃষ্টি নন্দন ছিলনা, স্বতন্ত্র এক নান্দনিকতা নিয়ে উদ্ভাসিত হতো। [হাসনাত, ২০১৬, পৃ. ১১৭]

লেখক, পাঠক, প্রকাশক, শিল্পী ও সুধী মহলে প্রচ্ছদ অঙ্কনে কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফির যে বিপুল সমাদর তা কিন্তু একদিনেই হয়নি। তিনি নিয়ত যেমন প্রচ্ছদ অঙ্কনের বিভিন্ন কলাকৌশল ও কম্পোজিশন নিয়ে ভেবেছেন তেমনি ভেবেছেন বইয়ের নামলিপি নিয়ে। শুরুর দিক থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর আঁকা বিভিন্ন দশকের প্রচ্ছদ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই

আশির দশকের আগ পর্যন্ত প্রচ্ছদে তিনি বিভিন্নরকম লিপি ও হস্ত লেখা ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন রোমান টাইপ। কিন্তু আমরা যেই হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফিকে কাইয়ুম চৌধুরীর একান্ত নিজস্ব বলে জানি এবং প্রচ্ছদে যেই স্টাইলের ক্যালিগ্রাফি দেখলেই আমরা বুঝতে পারি সেটা কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ। সেই হস্তলিপি স্টাইলটি তিনি নব্বইয়ের দশক থেকে ধীরে ধীরে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে ব্যবহার করতে থাকেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা একেবারে তাঁর নিজস্ব অংশ হিসেবেই পরিগণিত হতে থাকে।

কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে টাইপোগ্রাফি এবং ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত। অধ্যাপক মামুন কায়সার তাঁর একটি লেখায় বলেন– কাইয়ুম চৌধুরীর প্রথম দিককার কাজ ছিলো ক্যালিগ্রাফিক। পটভূমি ব্যবহার করতেন এক রঙে। তাঁর উপরেই তিনি টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফিকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন নানাভাবে। প্রথমদিকে সরাসরি তুলির টানে টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি করলেও কয়েক দশক পরে এসে তাঁর কাজে এই স্থানটি দখল করে নেয় কালিকলম। প্রথমদিকে সরলভাবে ছন্দায়িত টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি করলেও পরে এসে তিনি জ্যামিতিক ফর্মেরও আশ্রয় নিয়েছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর হাত ধরে প্রচ্ছদে টাইপোগ্রাফিক ডিজাইনের সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে এই যে নতুন ধারাটি প্রবর্তিত হলো, বাংলাদেশে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্রনের ইতিহাসে তা একটি মাইলস্টোন, কাইয়ুম চৌধুরী প্রতিনিয়ত টাইপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজের হস্তলিপির এমন একটি স্টাইল সৃষ্টি করেন যা তাঁর একান্তই নিজের। বহু দূর থেকে প্রচ্ছদে শুধু তাঁর টাইপটি দেখলেই বুঝা যায় এটি তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের ইতিহাসে এতো চমৎকার ও নান্দনিক হস্তলিপি দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। এখানেও কাইয়ুম চৌধুরী অনন্য, অসাধারণ। [কায়সার, ২০০৭, পৃ. ৯৪]

টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি ছিল কাইয়ুম চৌধুরীর এক অসম্ভব ভালো লাগার জায়গা। তিনি মনে করতেন প্রচ্ছদ, পোস্টার যেমন টাইপের ওপর ভর করবে, তেমনি পেইন্টিং কিংবা প্রিন্ট দাঁড়াবে 'রঙ থাকা' কিংবা 'না থাকা'র ওপর। [হাসনাত, ২০১৬, পৃ. ১৬৭] টাইপোগ্রাফির বিজ্ঞান আর ক্যালিগ্রাফির শিল্প- কাইয়ুম চৌধুরীর মতো কতজন বুঝেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করাই যায়। তাঁর আঁকা টাইপোগ্রাফি নিয়ে অশোক কর্মকার বলেন, 'টাইপোগ্রাফির মৌলিক যে গ্রামার তা স্যার কাজ করার সময় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। এই গ্রামারটা স্যারের সহজাত ছিল বলেই এত অসাধারণ টাইপোগ্রাফি স্যার লিখতে পারতেন। যেভাবেই লিখুননা কেন, তার নান্দনিকতায় সামান্যতমও কমতি থাকত না।' [হাসনাত, ২০১৬, পৃ. ১২৯]

কাইয়ুম চৌধুরী বাংলাদেশে বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পের জগতে এক কিংবদন্তিতুল্য নাম। কত নামীদামি লেখক তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের জন্য মুখিয়ে থেকেছেন, হা পিত্যেশ করেছেন। বইয়ের লেখার গুণের চেয়েও প্রচ্ছদ অলংকরণের সৌন্দর্যকে যেন অধিক আরাধ্য বলে বিবেচনা করা হতো। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের প্রসংশা করতে গিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন– 'কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদপটের অত্যন্ত সমাদর ছিল লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে। তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁদের প্রায় ধৈর্য্য হারানোর অবস্থা হতো। আমরা কেউ কেউ অনেক সময় তাঁকে হুমকি দিয়েছি, আর দেরি করলে অন্যকে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকিয়ে শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম ছেপে দেবো। বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচ্ছদ-অঙ্কনের অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর ছিল। বর্ণের বিন্যাস ছিল মোহনীয়।' [হাসনাত, ২০১৬, পৃ. ১৬] কাইয়ুম চৌধুরীকে এই জায়গাটিতে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ সাধনার পথ। বই পড়ার প্রতি নেশা ও পারিবারিকভাবে পড়ার অভ্যাস এই ক্ষেত্রে অনুঘটকের ন্যায় কাজ করেছে শিল্পীর জীবনে। তবে বই পড়ার থেকেও বই দেখার অর্থাৎ বইয়ের প্রচ্ছদ, ভিতরের অলংকরণ, মেক-আপ, বাঁধাই ইত্যাদির প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ।

কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদের প্রশংসা করতে গিয়ে *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের স্ত্রী মালেকা বেগম স্মৃতিচারণ করেন তাঁর লেখা বইগুলোর কথা। যেগুলোর প্রচ্ছদের সাথে মিশে আছে মহান শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর নাম। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত *নারী মুক্তি আন্দোলন*, *উইনির চোখে ম্যান্ডেলা* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী), *ইলামিত্র*, *স্নেহলতা* (সূচিপত্র), *নারীর কথা* (গণসাহায্য সংস্থা, মুদ্রক), *বাংলা সাহিত্যে যৌতুকের প্রতিফলন* (ইউপিএল), *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (প্রথমা)। একদিকে আনন্দ অন্যদিকে বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বলেন- 'আমার লেখা সর্বশেষ বই, প্রথমা থেকে প্রকাশিতব্য কীর্তিমান বাঙালি সিরিজের কিশোর জীবনীগ্রন্থ *সুফিয়া কামালের* প্রচ্ছদ ও অলংকরন কাইয়ুম চৌধুরী শেষ করে গেলেন অথচ দেখতে পাবেন না।' প্রতিটি প্রচ্ছদেই কাইয়ুম চৌধুরী ব্যবহার করেছেন অনিন্দ সুন্দর ক্যালিগ্রাফি। কাইয়ুম চৌধুর এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যার কথা বলতে গিয়ে মালেকা বেগম বলেন, 'ঐ মহামানব আসে।' [হাসনাত, ২০১৬, পৃ. ৭৩]

প্রচ্ছদে কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফির চাহিদার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর হাতের লেখার গুণে প্রতিটি প্রচ্ছদ যেনো হয়ে উঠতো আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র ও নান্দনিকতাপূর্ণ। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অসংখ্য প্রচ্ছদ রচনা করেছেন শুধু টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারে। ডিজাইনের জন্য সুন্দর টাইপোগ্রাফি ও নান্দনিক ক্যালিগ্রাফির মূল্য ডিজাইনার মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। একটি সুন্দর টাইপোগ্রাফি কিংবা ক্যালিগ্রাফির কম্পোজিশনও হতে পারে চমৎকার দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন। একটি সুন্দর টাইপোগ্রাফির অভাবে একটি চমৎকার ডিজাইন আবার ব্যর্থও হতে পারে। লেখক ও প্রকাশক মহলে তাঁর প্রচ্ছদের চাহিদা ছিল ব্যাপক, তার ক্যালিগ্রাফির প্রশংসা সর্বজনবিদীত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, প্রচ্ছদের ছবি যাই আঁকেন না কেন, তাতে কারও কোন আপত্তি নেই– শুধু অনুরোধ টাইপের বদলে যেন বইয়ের নামে তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেন।

গবেষণার স্বপক্ষে যুক্তি

প্রত্যেক প্রচ্ছদ শিল্পীরই কাজের একটা স্টাইল থাকে। অনেক শিল্পী প্রায় একই ঘরানার কাজ করেন বলে প্রচ্ছদ দেখেই তাদের আইডেন্টিফাই করা যায়। অনেক প্রচ্ছদ শিল্পী তাদের চিত্রকর্মের আদলে প্রচ্ছদ আঁকেন। সেক্ষেত্রে তিনি যদি শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠি হন তবে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ ও শিল্পকর্মের সামঞ্জস্যতার কারণে সহযেই তাকে চিহ্নিত করা যায়। অনেকেই আবার বিশেষ ধরনের টাইপফেস ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে প্রচ্ছদ আঁকেন। যার ফলে সেই বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটি দেখেও তাকে পাঠকরা আইডেন্টিফাই করতে পারেন। আবার অনেকেই প্রচুর প্রচ্ছদ নকশা করেন কিন্তু নিজস্ব কোনো আইডেন্টিটি নেই। কারণ প্রতিনিয়ত প্রচ্ছদে তারা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। সুনির্দিষ্ট একটা স্টাইলে থাকেন না। ফলে একটি প্রচ্ছদ দেখেই তাদের চিহ্নিত করা যায় না।

গবেষণার প্রসঙ্গিকতায় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে অন্যান্য প্রচ্ছদশিল্পীদের কাজের তুলনা করলে দেখা যায়, ঠিক কী কারণে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ সবার থেকে আলাদা? শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী মাঝে একটা সময় রোমান টাইপের উপর ভিত্তি করে প্রচ্ছদের নামলিপির নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও ধীরে ধীরে তার নিজস্ব একটি ক্যালিগ্রাফির স্টাইল তিনি তৈরি করেন। যা একান্তই তার নিজস্ব। এই ক্যালিগ্রাফির স্টাইলটি দীর্ঘ কয়েক দশক প্রচ্ছদের জগতে তাকে সবার থেকে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অনেক প্রচ্ছদশিল্পী রয়েছেন যারা বইয়ের বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচ্ছদে টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি আঁকেন কিংবা ফন্ট বাঁছাই করেন। এক্ষেত্রে শিল্পী কাইয়ুম

চৌধুরী এমন একটি ক্যালিগ্রাফিক স্টাইল আবিষ্কার করেছিলেন যা তিনি প্রায় সমস্ত রকমের প্রচ্ছদেই ব্যবহার করেছেন। বিস্ময়করভাবে দেখা যায় যে, এই একটিমাত্র ক্যালিগ্রাফির স্টাইল গুরুগম্ভীর মেজাজের বই থেকে শুরু করে হাস্য রসাত্নক যে কোন বইয়ের নামলিপিতে চমৎকারভাবে মানিয়ে যায়। এটি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মূলত নব্বইয়ের দশকের দিক থেকে পুরোপুরিভাবে তিনি ক্যালিগ্রাফির এই স্টাইলটি তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে পাকাপাকিভাবে ব্যবহার শুরু করেন। যা তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আলোচ্য গবেষণায় শিল্পী কাইয়ুম কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে তাঁর সৃষ্ট বিশেষ ঢঙের ক্যালিগ্রাফিই প্রধান অনুষঙ্গ তা অনুসন্ধানে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীতে শিল্পীর আঁকা প্রায় ছয় শতাধিক প্রচ্ছদ, কাইয়ুম চৌধুরীর উপর প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, ফিচার ও বিশিষ্টজনদের মতামত বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে–

১. তিনি সমগ্র জীবনভর প্রচ্ছদের নামলিপি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা স্টাইলে হাতে আঁকা টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করলেও আশির দশক থেকে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্যালিগ্রাফির স্টাইলটি তিনি আবিষ্কার করেন সেটিই ধীরে ধীরে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিনত হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে আমৃত্যু তিনি প্রচ্ছদে এই ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটিই ব্যবহার করেছেন। ফলে লেখক, প্রকাশক, শিল্প সমালোচক ও পাঠকদের কাছে এই ক্যালিগ্রাফির স্টাইলটিই কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

২. একটা সময় শুধু প্রচ্ছদের সম্মুখভাগ নকশা করা হতো। বর্তমান সময়েও অধিকাংশ প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে তাই করা হয়। কিন্তু শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সর্ব প্রথম তাঁর সৃজনশীলতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রচ্ছদের পশ্চাতপট অঙ্কন শুরু করেন। এর ফলে প্রচ্ছদ আর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না। প্রচ্ছদে এলো একধরনের গতিময়তা। এছাড়াও প্রচ্ছদ আঁকার ক্ষেত্রে হোক তা ক্যালিগ্রাফিক, ইলাস্ট্রেটিভ, ফটোগ্রাফিক কিংবা মিশ্র যে ভাবেই আঁকেন না কেনো, কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে একটি জিনিস সবসময়ই কমন। আর তা হলো তাঁর বিশেষ ঢঙের হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি।

৩. সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিটি হলো– প্রচ্ছদের পুটের নকশা। প্রচ্ছদের পুট একটি ছোট্ট অংশ। এটিকে তেমন গুরুত্ব দেবার কিছু নেই বলেই সকলে ধরে নেয়। কিন্তু একটি বইয়ের জন্য পুট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বইয়ের তাকে, লাইব্রেরিতে, বুক শপে বই ছড়িয়ে রাখা হয়না। থরে থরে তাকে সাজানো থাকে। তখন শুধু বইয়ের পুটটিই দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু আগে আমরা বইটি পছন্দ করি, তারপর পড়া শুরু করি। তাই এই পছন্দের ক্ষেত্রে সুন্দর পুটের নকশা পাটককে সেই বইটির ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। এই যায়গাটিতেই কাইয়ুম চৌধুরী নজর দিয়েছেন। যেহেতু প্রচ্ছদে তিনি তাঁর হাতে আঁকা আইকনিক ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেন। তাই প্রতিটি বইয়ের পুটের জন্য প্রচ্ছদের নামলিপির অনুরূপ সমান্তরাল ক্যালিগ্রাফিক টাইপ হাতে লিখে দিতেন। সেই সাথে একই স্টাইলে লেখকের নামও। অন্যকোন প্রচ্ছদশিল্পীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একেবারেই লক্ষ করা যায় না। ফলে একটি বই হাতে না নিয়েও তাকে থাকা অবস্থাতেই আইডেন্টিফাই করা যায় বইয়ের প্রচ্ছদটি কার আঁকা। এই যায়গাটিতে কাইয়ুম চৌধুরী সফল আর তাঁর সফলতার মূলমন্ত্র তাঁর হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি।

৪. সর্বশেষ একটি তুলনামূলক পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো। যেখানে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা ক্যালিগ্রাফিক, ইলাস্ট্রেশনধর্মী ও ফটোগ্রাফিক এই তিন ধরনের তিনটি প্রচ্ছদ নেয়া হয়েছে। তিনটি প্রচ্ছদ তিনটি ভিন্ন ধারার হলেও এদের মধ্যে একটি জিনিসেই মিল রয়েছে। আর তা

হলো গ্রন্থ ও লেখকের নামলিপির ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলটি। প্রচ্ছদে এই বিশেষ স্টাইলের ক্যালিগ্রাফির গুরুত্ব ও এটিই যে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের পরিচায়ক তা বোঝাতে তিনটি প্রচ্ছদেই মূল বিষয় ঠিক রেখে ভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করে একটি তুলনামূলক পার্থক্য দেখানো হলো। যার মাধ্যমে পাঠক সহজেই এই গবেষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

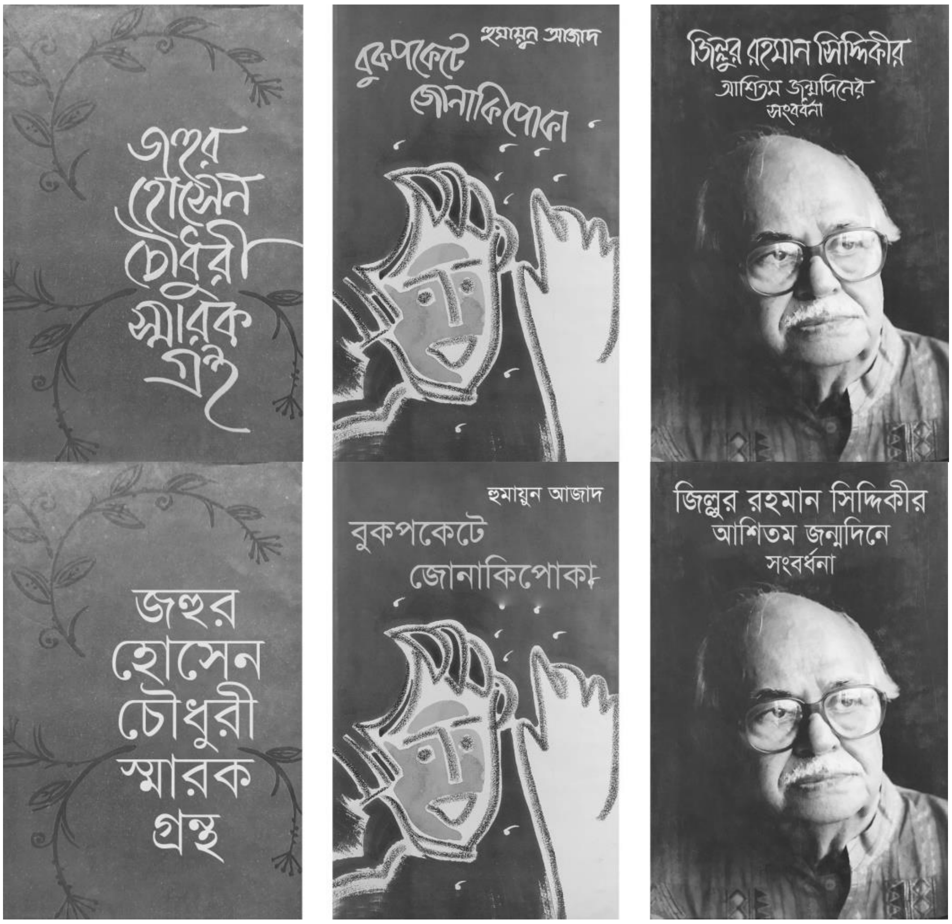

পরিসমাপ্তি

প্রচ্ছদ আঁকা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর একটি ভালো লাগার যায়গা। প্রথম জীবনে হয়তো জীবিকার প্রয়োজনে অর্থ সংকটে পড়ে প্রচ্ছদ আঁকার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু সেই যে প্রবেশ করলেন মৃত্যু অবধি প্রচ্ছদের ভুবন থেকে আর বের হতে পারেননি। তিনি এমন একজন শিল্পী ও প্রচ্ছদকারক যিনি তাঁর চিত্রকর্ম ও প্রচ্ছদগুলোকে একইসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর প্রচ্ছদগুলো হয়ে উঠেছিল অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এক ঝলক দৃষ্টিপাতেই যা কাইয়ুমের প্রচ্ছদ বলে বিবেচিত হয়। বইয়ের বিষয় ও প্রচ্ছদের ব্যাকগ্রাউন্ড যাই আঁকেন না কোনো তিনি তাঁর আঁকা প্রায় সমস্ত প্রচ্ছদেই হতে আঁকা

আইকনিক ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেছেন। আর অনিন্দ সুন্দর লেখার স্টাইলটিই পাঠক, লেখক, প্রকাশক, শিল্পী ও সাধারণ দর্শক সবার কাছে কাইয়ুম চৌধুরীর পরিচায়ক হিসেবে ধরা দিয়েছে। যেখানে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। পরিশেষে বলতে চাই, এই গবেষণা করতে গিয়ে আমি অত্যন্ত ব্যাথিত হয়েছি। কারণ সময়ের পরিক্রমায় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদের বইগুলোর নতুন নতুন সংস্করনে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশক পরিবর্তনের ফলে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদগুলোকে অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে। যার অধিকাংশেরই মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তাইতো প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক প্রচ্ছদের একটা বড় অংশ আজ বিলীন।

তথ্যসূত্র

আকন্দ, শাওন, (২০০৭)। গ্রাফিক ডিজাইন। সেলিম, লালা রুখ, সম্পাদিত। *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। পৃ. ১৭৬।

আকন্দ, শাওন, (২০০৭)। গ্রাফিক ডিজাইন। সেলিম, লালা রুখ, সম্পাদিত। *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। পৃ. ১৯৪।

আনিসুজ্জামান, (২০১৬)। কাইয়ুম চৌধুরী : মানুষ ও শিল্পী। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১৬-১৭।

আনিসুজ্জামান, (২০১৬)। কাইয়ুম চৌধুরী : মানুষ ও শিল্পী। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১৬।

কর্মকার, অশোক, (২০১৬)। দৃশ্যকলার বাঁশিওয়ালা। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১২৬।

কর্মকার, অশোক, (২০১৬)। দৃশ্যকলার বাঁশিওয়ালা। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১২৯।

কায়সার, মামুন, (২০০৭)। *বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি। পৃ. ৬।

কায়সার, মামুন, (২০০৭)। *বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি। পৃ. ৪৮-৪৯।

কায়সার, মামুন, (২০০৭)। *বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি। পৃ. ৯৪।

কায়সার, মামুন, (২০১৬)। প্রচ্ছদের জাদুকর কাইয়ুম চৌধুরী। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১০৯।

কায়সার, মামুন, (২০১৬)। প্রচ্ছদের জাদুকর কাইয়ুম চৌধুরী। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১১২।

জাবের, মইনুল ইসলাম, (২০১৬)। আমার বাবার মুখ। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ১৬৭।

বেগম, মালেকা, (২০১৬)। কাইয়ুম ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ৭১-৭২।

বেগম, মালেকা, (২০১৬)। কাইয়ুম ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। হাসনাত, আবুল, সম্পাদিত। *কাইয়ুম চৌধুরী : স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড। পৃ. ৭৩।

মৌসুমী, ফাতেমা আবেদীন নাজলার ব্লগ থেকে (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)। প্রচ্ছদ 'শিল্প' হয়ে উঠুক, [Online]. *www.bbarta24.net*. [Viewed 8 May 2024]. Available From: https://www.bbarta24.net/blog/89838

হক, সৈয়দ আজিজুল, (২০১৫)। *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*। ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন। পৃ. প্রচ্ছদের পশ্চাতপট।

হক, সৈয়দ আজিজুল, (২০১৫)। *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*। ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন। পৃ. ৮৬-৮৭।

হোসাইন, মামুন, (৬ মার্চ ২০২৩)। প্রচ্ছদ ও গ্রন্থচিত্রন, [Online]. *www.deshrupantor.com*. [Viewed 5 May 2024]. Available From: https://www.deshrupantor.com/412489/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3

[Abstract : The book cover is an integral part of the publication. The face of a book is its cover. The book cover is the reader's only means of communication with the book. All those who draw book covers in Bangladesh are basically artists first. Then book cover artist. So everyone's work has a different drawing style, variation in color application, innovation in composition. A book's future largely depends on its cover. Famous Bangladeshi artist Qayyum Chowdhury has done extensive experiments with the book cover. He has spent his whole life in improving the cover's beautification with aesthetics. His use of hand drawn calligraphy on the book cover is most popular. His special type of calligraphy has made him stand out in the field of book covers. Everyone else where busy with cover illustrations. There, Qayyum Chowdhury carried out a comprehensive experiment with the title lettering of a book cover. As a result, he invented a special type of calligraphic style for cover painting, the use of which makes a cover known as the cover of artist Qayyum Chowdhury. In this study, an attempt has been made to verify the adequacy of the subject through argumentation and judgment analysis. This study will make the reader think anew about artist Qayyum Chowdhury and his paintings. It will open the doors of new research to young researchers, illustrators, designers and readers.

Key Words : Book Cover, Illustration, Calligraphy, Qayyum Chowdhury.]